নৃবিজ্ঞান পত্রিকা (ISSN: 1680-0621), সংখ্যা ২৬, পৃ. ৩৯-৫১
© ২০২১ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ষাঁড়-লড়াই, লড়াইয়ের ষাঁড় এবং পুরুষত্ব : ইস্কাপন গ্রামের নারী-পুরুষের লিঙ্গীয় সম্পর্ক অনুধাবন

মোহাম্মদ জাভেদ কায়সার ইবনে রহমান*
তাসপিয়া মোহাম্মদ মেরিনা**

১. ভূমিকা

'অগু ষাঁড়োর মাইরা, এলাকার ফুয়াইনতে শখ করিয়া খেলে। ঐখানো ফুরিন কিগু যাইবো? ফুয়ারা গরু সামলানি, খাওয়ানি, পালাপুষা ইতা বাপ চাচাগো থাকি ফায়। ফুরিন তোর ইতাত ইন্টারেস্ট নাই।' (সিলেটের ইস্কাপন গ্রামে মাঠকর্ম চলাকালে ষাঁড়-লড়াইয়ে নারীর উপস্থিতি প্রসঙ্গে একজন বয়স্ক পুরুষের মন্তব্য।)

নারী ও পুরুষের সম্পর্ক লিঙ্গীয় মতাদর্শের উপর নির্ভরশীল, যা স্থানিক জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক চর্চার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মতো সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলেও ষাঁড়ের লড়াই একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক চর্চা। এই প্রবন্ধে ষাঁড়-লড়াই এবং লড়াইয়ের ষাঁড়কে মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে সিলেটের ইস্কাপন গ্রামের নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার রূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। নৃবিজ্ঞানসহ সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, লিঙ্গীয় আলোচনায় নারীত্ব কিংবা পুরুষত্বের কোন সার্বজনীন ও স্বীকৃত রূপ নাই; বরং স্থানিক সংস্কৃতিভেদে এর প্রকাশ ও চর্চা বিভিন্ন। এই ভিন্নতা বোঝার জন্য নির্দিষ্ট সমাজের সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক চর্চাগত জায়গাগুলোকে অনুধাবন করা প্রয়োজন, এবং একই সাথে এর মাধ্যমে যে সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলো উপস্থাপিত হয়, তা বিশ্লেষণ করা জরুরি। ষাঁড়-লড়াই বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচলিত খেলাই শুধু নয়, বরং একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চা এবং তা পুরুষত্বের নানাবিধ বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সামাজিক পরিসরে ধরা দেয় (See, Doughlass 1997, Pink 1997, Gannon & Pillai 2010, Almeida 1997, Brandes 2009, Beiras & de Alencar-Doughlass 1997, Pink 1997, Gannon & Pillai 2010, Almeida 1997, Brandes 2009, Beiras & de Alencar-Rodrígues 2015, Saimima & Mulyani 2018)। বাংলাদেশের বাস্তবতায়ও কিছু কিছু অঞ্চলে ষাঁড়-লড়াইকে একটি খেলা তথা সামাজিক চর্চা হিসাবে দেখা যায়। এই ষাঁড়-লড়াইয়ের মাধ্যমে সমাজের লিঙ্গীয় সম্পর্কের যে ধরন তা অনুধাবনের কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড না থাকলেও তা চর্চাগত জায়গা থেকে নারীত্ব ও পুরুষত্বের বিভিন্ন মতাদর্শিক উপস্থাপনে পক্ষপাতমূলক আচরণ করে (Pink 1997)। সিলেটের ইস্কাপন গ্রামের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর প্রাত্যহিক জীবনে লড়াইয়ের ষাঁড়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকলেও পাবলিক পরিসরে (public sphere) ষাঁড়-লড়াই কেন্দ্রিক যে আচার-অনুষ্ঠান (ritual) বা সামাজিক চর্চা, সেখানে কেবল পুরুষের উপস্থিতিই দেখা যায়, বিপরীতে সমগ্র প্রক্রিয়ায় নারী অদৃশ্য থেকে যায়। ষাঁড়-লড়াইকে ঘিরে নারীর এই অদৃশ্য হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া এবং চর্চাকে তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের স্থানিক পরিসরে পুরুষত্বের চর্চার বিপরীতে নারীত্বের অবস্থানকে বোঝার জন্য এই প্রবন্ধে লড়াইয়ের ষাঁড়কে একটি প্রধান উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। লড়াইয়ের জন্য ষাঁড়কে ছোট থেকে বড় হওয়ার প্রক্রিয়ার ভেতর নারীর অবস্থান, এবং ষাঁড় ও লড়াইকে ঘিরে সমাজে নারী-

---

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
ইমেইল : jvdkaisar-anp@sust.edu

** উন্নয়নকর্মী, জন হপকিন্স সেন্টার ফর কমিউনিকেশান্স প্রোগ্রাম, ঢাকা। ইমেইল : taspiamohammedm@gmail.com

পুরুষের যে পারস্পরিক অবস্থান, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। একটি ষাঁড় ছোট থেকে লড়াইয়ের উপযোগী হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক চর্চার মধ্য দিয়ে বড় হয়, যেখানে নারী ও পুরুষের আলাদা আলাদা সাবজেক্টিভ ভূমিকা (subjective role) বা নির্ধারিত চর্চা থাকে, যা কিনা আবার সেই সমাজের নারীত্ব ও পুরুষত্বকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে ষাঁড়-লড়াইকে ঘিরে যে আনুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক চর্চা বিরাজমান, সেখানে পুরুষের বিপরীতে নারীর অবস্থানকে বোঝার জন্য ষাঁড়ের পালন প্রক্রিয়া, ষাঁড়ের নামকরণ, মালিকানার ধরন, দর্শকের লিঙ্গীয় পরিচয় ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই গবেষণা কাজটি দুই মাসব্যাপী নিবিড় মাঠকর্মের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে, যেখানে ষাঁড়ের মালিক, ষাঁড়ের পরিচর্যাকারী, ষাঁড়-লড়াই পরিচালনা কমিটির সদস্যসহ ১৩ জন নারী ও পুরুষের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ২১ জন গ্রামবাসীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ১১ জন নারী ও ১০ জন পুরুষ রয়েছেন।

আলোচনার প্রথম অংশে খেলা, প্রতীক ব্যবস্থা ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানকে (rituals) নৃবিজ্ঞান কীভাবে অধ্যয়ন করে তা সংক্ষিপ্ত আকারে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে, ষাঁড়-লড়াইকে কেন্দ্র করে ইস্কাপন গ্রামের সাংস্কৃতিক চর্চা, স্থানীয় মতাদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রচলিত ধারণা ও নীতিবোধের মাধ্যমে পুরুষত্বের যে প্রতীকী উপস্থাপন হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অংশে ষাঁড়-লড়াইকে কেন্দ্র করে পুরুষত্বের যে নির্মাণ ঘটে, তা সামাজিক বিভিন্ন চর্চা ও আদর্শগত জায়গায় পুরুষের কী অবস্থান তৈরি করছে তা দেখানো হয়েছে। শেষ ভাগে, ইস্কাপন গ্রামে ষাঁড়-লড়াই ও লড়াইয়ের ষাঁড়কে কেন্দ্র করে নির্মিত পুরুষত্বের বিপরীতে নারীত্বের অবস্থানের ধরনগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. খেলা, আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতীক

বর্তমান সময়ে খেলাধুলার অনেক ধরন রয়েছে, এর মধ্যে বৃহৎ পরিসরে কিছু খেলাকে ঘরের বাইরের (outdoor) খেলা, আবার কিছু খেলাকে ঘরের ভেতরের (indoor) খেলা হিসেবে চিহ্নিত করি। প্রায় সমগ্র বিশ্বেই খেলাধুলা শারীরিক শ্রম, আবেগ, রাজনীতি, অর্থ ও নৈতিকতার বিষয়গুলোকে একই রেখায় নিয়ে আসে। ঘরের ভেতরের প্রযুক্তি নির্ভর বা বুদ্ধিবৃত্তিক যে সকল খেলা আছে, সেখানে শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ কম হলেও, অন্যান্য বিষয়গুলো প্রায় একইভাবে উপস্থাপিত হয়। সকল সমাজে সকল খেলাধুলাকে একইভাবে মূল্যায়ন করেনা। যারা খেলাধুলার সাথে মনস্তাত্ত্বিকভাবে গভীর যোগাযোগ স্থাপন করেন, তারাই খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে সমাজকে ভিন্নভাবে অনুধাবন করেন। খেলাধুলার স্থান হতে পারে ব্রাজিলের বড় কোন ফুটবল স্টেডিয়াম কিংবা সেনেগালের রেসলিঙের রিং, সকল পরিসরেই প্রায় একই ধরনের যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয় (Besnier et. al. 2018)। খেলাধুলার সাথে মানুষের শারীরিক সক্ষমতার যেমন বহিঃপ্রকাশ রয়েছে, একই সাথে এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ আবেগ এবং আবেগ থেকে উৎসারিত শক্তির সম্পর্ক আছে। এর মধ্যে বাজি ধরা, যাদুবিদ্যার চর্চা, সামাজিক সম্পর্ক, ক্রোধ ইত্যাদি বিষয়ও সম্পর্কিত, যা নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন এথনোগ্রাফিক আলোচনায় উঠে এসেছে। খেলাকে কেন্দ্র করে নৃবৈজ্ঞানিক যে তাত্ত্বিক আলোচনাগুলো বিদ্যমান তার আলোকে আমরা ষাঁড়-লড়াইকে একই সাথে একটি খেলা এবং সামাজিক চর্চা হিসাবে উপস্থাপন করেছি।

Kendall Blanchard ও Alyce Cheska এর ১৯৮৫ সালে The Anthropology of Sport নামক লেখায় প্রথম খেলাখুলা নিয়ে নৃবিজ্ঞানের আলাদা পরিসরে আলোচনা করা হয়। ঔপনিবেশিক কালে নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় খেলাধুলাকে শারীরবৃত্তীয় জায়গা থেকে দেখার প্রবণতা দেখা যায়, যেখানে 'পশ্চিমা সংস্কৃতি' (Western culture) বনাম 'বর্বর' (savage) সমাজের শরীরকেন্দ্রিক আলোচনা প্রাধান্য পায়, যেখানে এই দুই সমাজকে বিপরীত অবস্থানের আলোকে উপস্থাপন করা হয় (Besnier et. al. 2018)। অন্যদিকে, খেলাধুলাকে একটি আবেগীয় জায়গায় নিয়ে আসার পেছনে ভিক্টোরিয়ান সময়েরও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। খেলাধুলাকে একটি নির্দিষ্ট

সংস্কৃতির অংশ হিসাবে উপস্থাপনের মাধ্যম হিসেবে এই সময়কে দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীন সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রচুর পরিমাণে খেলাধুলার উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়, যা কিনা অনেক ক্ষেত্রেই একটি প্রাত্যহিক কার্যকলাপ হিসেবে দেখা হতো, এবং এই শরীরকেন্দ্রিক খেলাধুলা কোনভাবেই পশ্চিমা সভ্যতার আবিষ্কার নয় (প্রাগুক্ত)। খেলাধুলার বিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমান সময়ে বৃহৎ পরিসরে যে খেলাধুলা দেখতে পাই, তা শিল্পবিপ্লব ও তার পরবর্তী পুঁজিবাদের বিবর্তনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। অতি সমসাময়িক খেলাধুলার সাথে আধুনিক সভ্যতার জ্ঞানের বিকাশ, গাণিতিক বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তির নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

আচারের সাথে নাটকের (drama and play) যোগাযোগকে দেখতে পান ভিক্টর টার্নার। আচারগুলো উপস্থাপনার বা প্রদর্শনের মাধ্যমে উপস্থাপিত এবং পুনঃউপস্থাপিত হয়, যার সাথে আবার 'খেলা'র একটি মিল ও সম্পর্ক রয়েছে। নাটক, প্রদর্শনী কিংবা খেলা এসকল কিছুর মধ্যে একটি প্রদর্শনের শিল্প জড়িত থাকে। এখানে আচার-অনুষ্ঠান বা খেলা, উভয় ক্ষেত্রেই আত্ম-উপস্থাপনার (self-representation) বিষয়টি জড়িত থাকে (Besnier et. al. 2018)। এই কর্মকাণ্ডগুলো সামাজিক কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টার্নার একই সাথে খেলাকে নাটকের (play) সাথে তুলনা করেন, এবং নাটককে লিমিনাল (liminal) কর্মকাণ্ড হিসাবে উপস্থাপন করেন, যা আমাদের একটি আদর্শ জীবন ব্যবস্থার অংশ আবার একই সাথে সেখান থেকে বিযুক্ত। অর্থাৎ, এটি একটি মধ্যবর্তী দশা, যা একটি অবস্থা থেকে অন্য একটি অবস্থায় রূপান্তরিত হবার মধ্যবর্তী অবস্থায় বিরাজ করে। এই তাত্ত্বিক অবস্থানের আলোকে এই প্রবন্ধে ষাঁড়-লড়াইকে খেলা তথা একটি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান হিসাবে দেখানো হয়েছে। ষাঁড়-লড়াইয়ে এক ধরনের উপস্থাপনা ও পরিবেশনার বিষয় আছে, যা কেবল জয়-পরাজয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। অন্যদিকে ইস্কাপন গ্রামে ষাঁড়-লড়াই প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে আয়োজন করা হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা ষাঁড়ের মাধ্যমে সামাজিক গণ্ডিতে নিজেদের অবস্থানের কথা জানান দিয়ে থাকেন।

অন্যদিকে ক্লিফোর্ড গিয়ার্টজের প্রতীকবাদ ও বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের ধারণা দ্বারা এই প্রবন্ধটি অনেক বেশি অনুপ্রাণিত। গিয়ার্টজের আলোচনার সাপেক্ষে ইস্কাপন গ্রামের ষাঁড়-লড়াই ও একে ঘিরে যে সামাজিক চর্চা, ও প্রতীক ব্যবস্থা, তা বর্ণনা করা হয়েছে। গিয়ার্টজ তাঁর আলোচনায় বালিনিজ সমাজের সামাজিক চর্চায় সেখানকার ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান cockfight বা মোরগ লড়াইকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে একজন বালিনিজ পুরুষকে কীভাবে মোরগের শক্তিমানতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তা দেখিয়েছেন। এছাড়াও, বালিনিজ ককফাইট একটি আচার হিসেবে সামাজিক পরিসরে কী করে প্রতীকী অর্থময়তা নির্মাণ করে তা মোরগ লড়াইয়ের ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেখিয়েছেন। কিন্তু তার সমগ্র আলোচনায় লিঙ্গীয় সম্পর্কের কোন বিষয় উঠে আসেনি, যা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের থেকে ভিন্ন। কিন্তু তিনি প্রতীককে গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছেন, যা এই গবেষণায় ষাঁড়-লড়াইকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রভাব রেখেছে। একই সাথে, এই প্রবন্ধে গিয়ার্টজের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যামূলক তত্ত্বের আলোকে ষাঁড়-লড়াই কেন্দ্রিক বিভিন্ন চর্চা, যেমন ষাঁড়ের নামকরণ, ষাঁড়ের পরিচয়, লড়াই দেখতে যাওয়া দর্শক, সমিতির মালিকানা আবার ষাঁড়-লড়াইয়ের মাধ্যমে পুরুষের নির্মিত হওয়া সামাজিক পুঁজি, মর্যাদা এবং নারীর সামাজিক পরিচয়, নারীর লোক সমাবেশে উপস্থিতি ইত্যাদিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে পিয়েরে বর্দ্যুর (১৯৮৬) পুঁজির ধারণাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ করে ষাঁড়-লড়াইয়ে ষাঁড়ের উপর মালিকানা কীভাবে সামাজিক ও প্রতীকী পুঁজি হিসেবে কাজ করে। একই সাথে এই পুঁজিগুলো কীভাবে নতুন ডিসকোর্স উৎপাদন ও বিস্তারে ভূমিকা পালন করে তাকেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে, অর্জুন আপাদুরাই তার বিখ্যাত *Modernity At Large* (1996) গ্রন্থে ক্রিকেট খেলাকে আধুনিক রাষ্ট্রের সামষ্টিকতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য জাতীয়তাবাদী চেতনা হিসাবে কীভাবে কাজ করে তাকে বিশ্লেষণ

করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। খেলাকে শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে না দেখে এর সাথে সমাজের অন্যান্য যে সামাজিক ব্যবস্থাগুলো আছে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

৩. ষাঁড়-লড়াই ও পুরুষত্ব

খেলা হিসেবে ষাঁড়-লড়াই বাংলা অঞ্চলে অনেক প্রাচীন কাল থেকেই চর্চিত হয়ে আসছে। স্থানীয় ভাষায় এই লড়াইকে 'মাইর' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়, এবং লড়াইয়ের ষাঁড়কে মাইরের ষাঁড় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যা এই প্রবন্ধে স্থানীয় ভাষা হিসেবে উপস্থিত থাকবে। নৃবিজ্ঞানে খেলা এবং লিঙ্গীয় সম্পর্কের আলোচনা আশির দশকে শুরু হলেও মার্গারেড মীডের Sex and Temperament in Three Primitive Societies (1934) আলোচনায়, তৎকালীন লিঙ্গীয় মতাদর্শের পশ্চিমা ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন, এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমাজে লিঙ্গীয় সম্পর্কের ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়। খেলাধুলার সাথে লিঙ্গভিত্তিক শারীরিক যে সক্ষমতার কথা বলা হয়, তা বিভিন্ন সমাজের বাস্তবতায় নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রশ্নবিদ্ধ হয় (দেখুন, Besnier et. al. 2018: 128, Wellard 2009)। অন্যদিকে, খেলা ও লিঙ্গভিত্তিক শারীরবৃত্তীয় যে রাজনীতি বিরাজমান, সেখানে সমাজ কর্তৃক নারী ও পুরুষের আলাদা সাবজেক্টিভ ভূমিকা নির্মিত হতে দেখা যায়। এই সাবজেক্টিভ ভূমিকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে পুরুষত্বের নির্মাণ প্রক্রিয়া যা আবার বিভিন্ন সমাজে আলাদা আলদা ভাবে দেখা যায় (Connell 1995)। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে স্পেন, পর্তুগাল, মেক্সিকোতে মানুষের সাথে ষাঁড়ের লড়াইয়ের নানা ধরনের খেলা অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে হিংস্র ষাঁড়কে নানাভাবে আহত করে অবশেষে হত্যা করে যে চরিত্রটি, সেটি মেটাডোর (Metador) নামে পরিচিত। ষাঁড়-লড়াইয়ের নানা ধরনের খেলার সাথে পুরুষত্ব ও এর নির্মাণের একটি যোগাযোগ বিভিন্ন গবেষণায় উঠে আসে, যেখানে এই পুরুষদের বীর, বা ক্ষমতাশালী হিসেবে বিবেচনাকরা হয়। এই পুরুষত্বের ধারণাটি অনেক সমাজেই হেজেমনি আকারে বিরাজ করে, এবং একে মানদণ্ড বিবেচনা করে সমাজের নারীত্বের ধারণাও নির্মিত হয় (দেখুন : Saimima & Mulyani 2018, Kabaji 2008, Beiras et. al. 2015)। পুরুষত্বের এই চর্চাগুলো নারীর অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলে, এবং নারী কীভাবে বা কোন পরিসরে তার গতিশীলতা সীমাবদ্ধ রাখবে, কিংবা তার সাবজেক্টিভ ভূমিকা কী হবে তাও একভাবে নির্দেশ করে, যা আমরা ইস্কাপন গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাই।

ইস্কাপন গ্রামে ষাঁড়ের লড়াইয়ের ইতিহাস অনেক বছরের, এবং এই গ্রামের পরিচিতির অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে এই লড়াই বা মাইর। এটা সমাজে অনেক বছর ধরে চর্চিত হয়ে আসা একটি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বা সামাজিক চর্চা যেখানে লড়াইয়ের ময়দানে দর্শক হিসেবে নারীর উপস্থিতি সামাজিক আচার বহির্ভূত। অর্থাৎ মাইর চলাকালে মাঠে পুরুষের উপস্থিতি থাকলেও নারীদের উপস্থিতি সেখানে নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে একজন তথ্যদাতা বলেন, '*ফুরিনতের শখ নাই। অখন যদি এমন অয়, আমার বাড়ির সামনে আইলো, তাইলে উঠান থাকিয়া দেখবো। জাগাত গিয়া কোন ফুরিন দেখার সাহস করে না। (নারীদের এটা দেখার শখ নাই। যদি বাড়ির সামনে হয় তবে উঠান থেকে দেখতে পারে। কিন্তু মাঠে নারীরা যাবার সাহস করে না)*।'

সামাজিক চর্চায় আনুষ্ঠানিক লড়াইয়ের ময়দান হয় গ্রামের বড় মাঠে, যা অধিকাংশ বসতবাড়ি থেকে দূরে অবস্থিত। এই ময়দানে নারীর উপস্থিতিকে স্বাগত জানানো হয় না, বরং এই ময়দানে নারী আসার সাহস রাখেনা, অর্থাৎ, এই স্থানে, ঐ নির্দিষ্ট সময়ে নারীর গতিশীলতা কী হবে তা একভাবে সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত, এবং তা সমাজে চর্চিত। অন্যদিকে, নারীর ঘরের সামনের উঠানে যদি ছোট পরিসরে মাইরের আয়োজন করা হয়, তবে, নারী তা দেখার অধিকার রাখে। লড়াইয়ের ময়দান বা মাঠকে যদি প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে তার আলোকে সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারীর 'অধিকার' এবং

'সাহস' বিশ্লেষণ করা সম্ভব। অর্থাৎ, নারীর গতিশীলতার সাথে স্থান, সময় এবং সামাজিক মর্যাদা ও সামাজিক শৃঙ্খলার বিষয়গুলো জড়িত। এই নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার অধিকার ঐ নির্দিষ্ট সময়ে শুধুমাত্র পুরুষদের থাকে এই গ্রামের বাস্তবতায়, যা পুরুষত্বের গতিশীলতার একটি প্রতীক হিসেবেও ধরা দেয়, অন্যদিকে স্থানীয় বাস্তবতায় পুরুষত্বের যে সামাজিক অবস্থান, সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

এই গ্রামে মাইর বিষয়ে অধিক আগ্রহ দেখা যায় গ্রামের কিশোরদের মাঝে। এই গ্রামীণ কিশোররা ছোট ছোট পরিসরে বাড়ির উঠানে, কিংবা আবাদি খালি জমিতে মাইরের আয়োজন করে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বাজি'[ii] হিসেবে বিবেচিত হয় না। এই চর্চাগুলো তাদের ভবিষ্যতে বড় পরিসরে বড় মাঠে লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে চিহ্নিত করেন গ্রামীণ কিশোররাই। অন্যদিকে গ্রামের কিশোরীদের পারিবারিকভাবে এই লড়াই সংক্রান্ত বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা হয়। এই খেলাকে নির্দেশ করা হয় পুরুষদের কাজ হিসেবে, এ প্রসঙ্গে একজন মধ্যবয়সী নারী তথ্যদাতা বলেন, '*খেলা বেডাইনতের, ফুরিনতের ওখানো কি কাম (খেলা পুরুষের, নারীর সেখানে কি কাজ)*। অর্থাৎ এই ইস্কাপন গ্রামে নারীর যে সাবজেক্টিভ ভূমিকা সেখানে, শুধু লড়াই নয়, বরং খেলাকেও লিঙ্গীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে দেখা হয়। এই গ্রামে 'ঘরের বাহিরের খেলাকে' (পাবলিক পরিসর) পুরুষের সাথে এবং ঘরের ভেতরের (প্রাইভেট পরিসর) খেলাকে নারীর সাথে সম্পর্কিত করে দেখা হয়। এমন ধারণা গ্রামের পুরুষরা উপস্থাপন ও চর্চা করেন, এমনটা নয়, বরং নারীদের বক্তব্যেই তা উঠে আসে।

ইস্কাপন গ্রামে লড়াইয়ের জন্য আলাদা ষাঁড় কিনে আনেন লড়াইয়ে অংশ নেয়া পরিবারগুলো। এই ষাঁড়গুলো কেনা হয় সাধারণত ছোট অবস্থাতেই। এই ষাঁড়গুলো বাছুর থেকে ষাঁড় হয়ে উঠার প্রক্রিয়ায় অনেক যত্নে পালিত হয়, যা একটি সাধারণ গরু বা ষাঁড় থেকে একদমই আলাদা। সাধারণত আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারগুলো লড়াইয়ের জন্য ষাঁড় পালন করে থাকেন, যাদের অনেকেই স্থানীয়ভাবে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল। অনেক মালিক বিদেশে থাকেন, তার হয়ে, তার আত্মীয় বা কাছের বন্ধু বা ছোট ভাই ষাঁড় লালন পালন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই লড়াইয়ের ষাঁড়ের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়, এবং এক বা একাধিক লোক নিয়োগ করা হয় তার লালন-পালনের জন্য। ঘরের অভ্যন্তরে ষাঁড়ের যত্ন করার দায়িত্ব পরিবারের নারী সদস্যরাও নিয়ে থাকেন, তবে পাবলিক পরিসরে দৃশ্যমান থাকেন পুরুষেরা। ইস্কাপন গ্রামে যে নারী-পুরুষের লিঙ্গীয় সম্পর্কের ধরন ও নির্মাণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও সম্পর্কযুক্ত। ষাঁড়কে ঘিরে যে চর্চা, সেগুলো মূলত হয়ে থাকে লড়াইয়ের ষাঁড় আছে এমন পরিবারে, যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে অন্য অনেকের চেয়ে ভালো। এই সকল পরিবারে উৎপাদিত লিঙ্গীয় মতাদর্শিক জ্ঞানগুলো আবার সমাজের অন্যান্য অর্থনৈতিক শ্রেণির মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, গ্রামের অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল পরিবারগুলোও ষাঁড়-লড়াই বা মাইরের ময়দানে নারীর উপস্থিতি ও পাবলিক পরিসরে সেই ষাঁড়ের যত্নে নারীর উপস্থিতিকে স্বীকৃতি জানায় না। অর্থাৎ, ধনী কিংবা গরিব, ষাঁড়ের মালিক কিংবা দর্শক, গ্রামের সকলেই নারীকেন্দ্রিক লিঙ্গীয় মতাদর্শিক জায়গায় একাত্মতা প্রকাশ করেন।

ষাঁড়ের নাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয় স্থানীয় বাস্তবতায়। ষাঁড়ের নাম সংক্রান্ত নানা ধরনের ডিসকোর্স চালু আছে, এবং এই নামের সাথে পরিচয় নির্মাণের রাজনীতিকেও যুক্ত করে দেখা যেতে পারে। ষাঁড়ের নাম শুধু মাত্র ষাঁড়টিকে নির্দেশ করেনা বরং এর মাধ্যমে ষাঁড়ের মালিক ও তার সামাজিক অবস্থানকেও ব্যাখ্যা করা হয়। ইস্কাপন গ্রামে ষাঁড়ের নামের ক্ষেত্রে পুরুষালী নাম ও এর সাথে সমাজে বিদ্যমান ডিসকোর্সগুলোকে সম্পৃক্ত করে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এ নামকরণের ক্ষেত্রে টেলিভিশন মিডিয়া এবং ইন্টারনেট বা প্রযুক্তির প্রবণতা খেয়াল করা যায়। টেলিভিশনে প্রচারিত রেসলিঙের বিভিন্ন নাম অনুসরণে দেয়া ষাঁড়ের নাম পাওয়া যায় মাঠকর্মে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : বিগ শো, জন সিনা, আন্ডারটেকার, রক। এই নামগুলোর প্রতিটি নামই রেসলিঙে শক্তিশালী, সুঠাম ও বীর হিসেবে পরিচিত।

অনেক ক্ষেত্রেই ষাঁড়ের মালিকের ব্যক্তিগত নামকে ছাপিয়ে যায় এই নামগুলো, এবং মালিক ষাঁড়ের নামেই পরিচিতি লাভ করে, সেই বিবেচনায়, ব্যক্তির পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে লড়াইয়ের ষাঁড়ের নামের উপর নির্ভর করে। সাধারণত অন্য এলাকা থেকে আগত ষাঁড়ের মালিক যদি পরিচিত ব্যক্তি না হয়, তখন ষাঁড়ের নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। আবার স্থানীয়ভাবে পরিচিত ব্যক্তির ষাঁড়, ব্যক্তির নামের উপরেও পরিচিতি লাভ করে। তবে ষাঁড়ের নাম খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই সমাজে বিবেচিত হয়।

অনেক সময়, ষাঁড়ের নাম রাখা হয় তার শরীরের রঙের উপর নির্ভর করে, যেমন ব্ল্যাক ডায়মন্ড অথবা রেডবুল। অন্যদিকে, বাংলা সিনেমার খলনায়কের নামেও নামকরণ করতে দেখা যায়, যেমন কাবিলা, ডিপজল ও জাম্বু। এই সকল ক্ষেত্রেই যে নামগুলো ষাঁড়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটি নামের সাথে 'পুরুষত্বের' কিছু ইমেজের সম্পর্ক রয়েছে। এই নামগুলো যে পুরুষগুলোকে নির্দেশ করে, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে অনেক বেশি শক্তিশালী 'কঠোর, 'হিংস্র', 'নির্দয়' অথবা 'তেজী' হিসেবে উপস্থাপিত হয়, যারা সহজে 'পরাজয়' মেনে নেয় না। অর্থাৎ, ষাঁড়ের নামকরণের ক্ষেত্রে সমাজে পুরুষের শক্তিময়তা ও কঠোরতার কল্পিত 'ইমেজ'কে ব্যবহার করা হয়। এই নামগুলো, সাধারণ পুরুষকে নির্দেশ করতে ব্যবহার করা হয় না, বরং পুরুষের আলাদা একটা ধরনকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়, যে পুরুষ সহজে পরাজিত হয় না, কিংবা অন্যের উপর বল প্রয়োগের সক্ষমতা রাখে। স্থানীয় ষাঁড়ের মালিকরা মনে করেন, ষাঁড়ের নামের সাথে মনোবলের একটা সম্পর্ক আছে এবং শক্তিশালী নাম প্রতিপক্ষকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে ষাঁড়-লড়াই কমিটির সভাপতি বলেন, '*ষাঁড়োর নাম অইতো ভারী, যিতা শুনলে লাগে অনেক মাইর দিবো। আরেক দলের তো ডরানি লাগবো (ষাঁড়ের নাম ভারি হওয়া দরকার, যেন শুনলে মনে হয় সে অনেক আঘাত করবে। নাম শুনে প্রতিপক্ষের তো ভয় পাওয়া লাগবে)*'। তাই নামকরণের ক্ষেত্রে 'পুরুষের শক্তিমানতা' নির্দেশকারী নামগুলোকেই ষাঁড়ের নাম হিসেবে বেছে নেয়া হয়।

অন্যদিকে, কেন নারীর নাম ষাঁড়ের জন্য ব্যবহার করা যাবেনা, এমন প্রশ্নকে অনেকটাই অবান্তর মনে করেন স্থানীয় ষাঁড়ের মালিকগণ, এবং এই বিষয়টিকে খুবই হাস্যকর বিষয় হিসেবেই বিবেচনা করেন। এমন প্রশ্নের উত্তরে একজন বলেন, '*না না...ইতা নাম কোনানো পাইবেন না, হা হা হা। ফুরিনতা নামো ষাঁড়োর নাম অয় না...হা হা হা।*' এলাকার ষাঁড়ের নাম নারীর নামে হওয়াটা কয়েকটি বিবেচনায় অসম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন, এর প্রথমটি হচ্ছে, প্রাণীটির লিঙ্গীয় পরিচয়। ষাঁড় পুরুষ লিঙ্গের, কেন তার নাম স্ত্রী লিঙ্গের হবে? এমন পাল্টা প্রশ্ন করেন কেউ কেউ। দ্বিতীয়ত, ষাঁড়ের নামের সাথে তার মালিকের নাম ও পরিচয় সম্পর্ক যুক্ত। ষাঁড়ের নাম যদি নারী-নির্দেশক নামে নামকরণ করা হয় তবে তা সামাজিক পরিচিতির সংকট তৈরি করবে, এবং তা গ্রামীণ সমাজে শরম বা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নারী নির্দেশক নামগুলো ষাঁড়ের মালিকদের সামাজিক যে পরিচয় বহন করে, তাতে লজ্জিত হবার সম্ভাবনা থাকে, এবং একই সাথে তা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও প্রান্তিক করে তুলতে পারে বলে মনে করেন লড়াইয়ের ষাঁড়ের মালিক পুরুষগণ।

ষাঁড়-লড়াইয়ের অনেক ধরনের আচারের সামাজিক বৈধতা দান করে ষাঁড়-লড়াই কমিটি। সাধারণত, এই কমিটির সভাপতি হয়ে থাকেন স্থানীয় চেয়ারম্যান অথবা স্থানীয় রাজনীতিতে সংযুক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। কার্যনির্বাহী সদস্যদের প্রধান কাজ থাকে মাইরসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি দেখাশোনা করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সমিতির সদস্যরা প্রত্যেকেই বিভিন্নভাবে মাইরের সাথে সংযুক্ত। স্থানীয়ভাবে বড় মাইরগুলো কখন হবে, কোন গ্রামের সাথে কোন গ্রামের মাইর হবে তাও সমিতির মাধ্যমে ঠিক হয়ে থাকে। এই কমিটিতে কখনই নারীর উপস্থিতি থাকেনা। অন্যদিকে, নারীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, কোন নারী যদি এই লড়াইয়ে ষাঁড় বাজি রাখতে চায়, তবে সমাজ তাকে কোনভাবেই ভালো চোখে দেখবেনা, যে কারণে সামাজিক চাপে কোন নারীর ইচ্ছা থাকলেও তা প্রকাশ করেন না। কোন একটি সমাজে কোন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হবে তা নির্ভর করে সমাজ বাস্তবতার উপর,

এবং এই বাস্তবতায় ষাঁড়-লড়াইকে সমাজের কিছু পুরুষ তাদের সামাজিক আধিপত্য ও ঐতিহাসিক চর্চার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক চর্চায় রূপ দিয়েছেন। আমরা যদি পূর্বের প্রথা সংক্রান্ত আলাপের সাথে ষাঁড় লড়াইকে যুক্ত করে দেখি, তবে দেখা যায়, যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে এই সমাজের আচার হিসেবে ষাঁড়-লড়াইয়ে পাবলিক পরিসরে নারী সম্পূর্ণভাবেই অদৃশ্য, একই সাথে নারীর পাবলিক পরিসরে লড়াই বা মাইরসংক্রান্ত যাবতীয় আলাপ এবং অংশগ্রহণের ইচ্ছাকে সম্মানহানিকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা একভাবে এই সমাজের লিঙ্গীয় মতাদর্শের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

৪. লড়াইয়ের ষাঁড় ও পুরুষত্বের প্রতীক

'কমিটিত থাকিয়াও তো লাভ অয় নানি, ধরেন আফনেরে লোকে চিনলো, দূর গাঁও থাকি মানুষ আসে ইখানো। মাইকিং করের না নি নাম! লোকে জানলো, ইনারা ইতা শখ করেন। পুরা ডিসটিক চিনো। লাভ লসের কিছু না, ইতা সুন্দর!' ষাঁড়-লড়াইয়ের সাথে সম্পর্কিত থাকার মাধ্যমে সামাজিক পরিচিতি অর্জিত হয় বলে মনে করেন ষাঁড়-লড়াই কমিটির এক ত্রিশ-উর্ধ্ব ব্যক্তি। এই ষাঁড়ের লড়াইয়ের কমিটিতে থাকা কিংবা ষাঁড়ের লড়াইয়ে ষাঁড় থাকার মাধ্যমে এক ধরনের প্রতীকী পুঁজি (symbolic capital) অর্জিত হয়। এই ধরনের কাজে অংশ নেয়াকে এই সমাজে মূল্যায়ন করা হয়, এবং এর মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতি অর্জিত হয়, যা বর্দ্যু প্রতীকী পুঁজি হিসেবে দেখিয়েছেন (Bourdieu 1986)। এই কাজে সংশ্লিষ্ট থাকার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কোন মুনাফা তাঁরা অর্জন করেন না, কিন্তু তা সমাজে পরিচিতি বৃদ্ধি করে। নিয়াম খান, ষাঁড়-লড়াই সমিতির সভাপতি হিসেবে ১০ বছর ধরে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। যদিও তিনি গ্রাম্য সালিশ পরিষদে দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালন করে গেছেন, স্থানীয় লোকজন তাকে মাইরের সমিতির সভাপতি হিসেবেই চিনেন। মাঠকর্মের সময় তার বাড়ি খুঁজে পাওয়ার জন্য যখন তার সালিশ পরিষদের পরিচয় ব্যবহার করা হয়, স্থানীয় লোকজন তার বাড়ির ঠিকানা দিতে না পারলেও, যখন তাকে 'মাইরো ষাঁড় লাগানি নিয়াম খান' বলে পরিচয় দেয়া হয়, অনায়াসে বাড়ি দেখিয়ে দেয় লোকজন। নিয়াম খান এবং সমিতির বাকি সদস্যদের মাইরের লোক হিসেবে সামাজিক যে স্বীকৃত ও সম্মানের সাথে এর প্রতীকী পুঁজির যোগাযোগ বিদ্যামান। ইস্কাপন গ্রামে ষাঁড়-লড়াইকে ঘিরে নারীর যৌনতার কোন ডিসকোর্স সরাসরি পাবলিক পরিসরে আলোচনা না হলেও, তাকে উপজীব্য করে নারীকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখার প্রবণতা দেখা যায়; বিপরীতে লড়াইকে ভর করে পুরুষত্বের প্রতীকী বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে।

লড়াইয়ের জন্য ষাঁড় পালন করা সামাজিক পরিচিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। লড়াইয়ের জন্য একটি ষাঁড়কে যখন কিনে আনা হয় তার বয়স থাকে দুই থেকে তিন বছর। তথ্যদাতাদের মতে এই অবস্থায় ষাঁড়ের ক্রয়মূল্য থাকে ষাট থেকে আশি হাজার টাকা। লড়াইয়ের ষাঁড়ের পালনের জন্য যে খাবার খাওয়ানো হয়, তা প্রধানত ভুসি, গম, ভুট্টার মিশ্রণ। যা প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচ কেজি করে প্রত্যেক ষাঁড়কে খাওয়ানো হয়। যার কেজি প্রতি মূল্য ৩০০ টাকা থেকে সাড়ে চারশ টাকা এবং মাসে ষাঁড়ের খাবার ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ প্রায় পনের থেকে বিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ বাস্তবতায় একটি মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এই ব্যয় মিটানো অসম্ভব। অন্যদিকে, ইস্কাপন গ্রাম সিলেটের প্রবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে অন্যতম, যাদের অর্থের একটা বড় জোগান আসে রেমিটেন্স থেকে। এই বাস্তবতায়, লড়াইয়ের ষাঁড় নিছক লড়াইয়ের ষাঁড় নয়, বরং এর সাথে সামাজিক মর্যাদা তথা প্রতীকী পুঁজির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। একজন ব্যক্তি ষাঁড়ের লড়াইয়ের সাথে সম্পৃক্ত সমিতির সদস্য কিংবা ষাঁড়ের মালিককে সামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি মর্যাদার হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সামাজিক সম্পর্কগুলো হঠাৎ বা অল্প সময়ে অর্জিত হয়না, বরং এটা একটি দীর্ঘ মেয়াদি সম্পর্কের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এই দীর্ঘ সময় ধরে সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে যে পুঁজি উৎসারিত হয় তার সাথে সামাজিক বিভিন্ন প্রতীকের দীর্ঘ মেয়াদি মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় সামাজিক পুঁজি।

অন্যদিকে সমাজের ভেতরে ষাঁড়-লড়াইকে ঘিরে যে সাংস্কৃতিক চর্চা এবং যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে ষাঁড়-লড়াইয়ের মাধ্যমে একটি আলাদা বিশিষ্ট শ্রেণি নির্মিত হয়েছে যাকে এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক পুঁজি বলা যায়।

ইস্কাপন তথা সিলেটের বিভিন্ন গ্রামের সামাজিক বাস্তবতায়, যে সকল পরিবারগুলোর সদস্যরা ইংল্যান্ড প্রবাসী সেই সকল পরিবারের সাংস্কৃতিক ও প্রতীকী পুঁজি স্থানীয় গ্রামবাসীদের তুলনায় বেশি হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ, স্থানীয় গ্রামবাসীদের মতে, ইংল্যান্ডে থাকা অনেক সম্মানের এবং এটি একটি আলাদা যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই বিদেশ থাকা এবং না থাকার মাঝে একটি অদৃশ্য সামাজিক দ্বন্দ্ব দেখা যায় গ্রামের প্রেক্ষাপটে। এই অস্পষ্ট ও অদৃশ্য দ্বন্দ্বে লড়াইয়ের ষাঁড়ের উপর মালিকানা একধরনের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়। ইস্কাপন গ্রামের স্থানীয় রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিগত এগারো বছর ধরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে যারা উপবিষ্ট ছিলেন, তাদের প্রত্যেকেই ষাঁড়-লড়াইয়ে ষাঁড় বাজি লড়ে অভ্যস্ত। অন্যদিকে, স্থানীয় রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ নেই, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসম্পদের মালিক, এবং লড়াইয়ের ষাঁড়েরও মালিক, তাকে সামাজিকভাবে বিশেষ মূল্যায়ন করা হয়। স্থানীয় রাজনীতি এবং এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে লন্ডন প্রবাসীদের তুলনায় এদের প্রাধান্য বেশি দেয়া হয়। 'লড়াইয়ের ষাঁড়ের মালিক' হিসেবে সামাজিক পরিচয় তাদেরকে সাধারণ গৃহস্থ কিংবা লন্ডন প্রবাসীদের চেয়ে আলাদা অবস্থানে উন্নীত করে।

ইস্কাপন গ্রামে ষাঁড়-লড়াইকে ঘিরে কিশোরদের মাঝে এই মাইরের সংস্কৃতির পুনরুৎপাদন ঘটে। ষাঁড় লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলোতে ষাঁড়-লড়াইয়ের যে সামাজিক ধারণা এবং ষাঁড়ের উপর আধিপত্য বিরাজ করার মধ্য দিয়ে পুরুষত্বের যে চর্চা, তা দুইভাবে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়। প্রথমত, ঐ সকল পরিবারের বাবা-চাচারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এ ধরনের খেলায় সরাসরি উৎসাহিত করে, এবং সকল সময়ে এই সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত করে। যেমন, লড়াইয়ের ষাঁড়ের যত্ন করা, মাঝে মধ্যে বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। একইসাথে বাড়ির উঠানে ছোট পরিসরে লড়াইয়ের আয়োজন করা, যেখানে বড় ধরনের বাজি ধরা হয় না, কিন্তু ষাঁড়ের লড়াইয়ের মনোভাবকে টিকিয়ে রাখা এবং পরখ করে দেখাই অন্যতম লক্ষ্য থাকে। এইরকম লড়াইয়ে ষাঁড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারাটাকে বিশেষ গুণাবলি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইস্কাপন গ্রামেও ষাঁড়-লড়াইকে ঘিরে পুরুষের যে অবস্থান, এবং পুরুষের জয়কে উদযাপনের যে ধরন, সেখানে আসলে ষাঁড় মাঠে লড়াই করে না, বরং পুরুষ লড়াইয়ে অংশ নেয়। পারিবারিকভাবে 'পুরুষ' হয়ে ওঠা এই গ্রামে একটি যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়, এবং এই নতুন পুরুষকে 'পুরুষ' হয়ে ওঠার শিক্ষাটা প্রদান করে তার পূর্ববর্তী পারিবারিক পুরুষেরা।

দ্বিতীয়ত, যে সকল পরিবারে ষাঁড় নেই, কিন্তু কিশোর বা তরুণরা আছে, যাদের কাছে এই ষাঁড়-লড়াই একটা অতি আকর্ষণীয় খেলা। যে সকল পরিবারের অর্থনৈতিক সামর্থ্য নেই, সেই সকল পরিবারের সন্তানরা নিকটবর্তী ষাঁড়-মালিক পরিবারের সাথে সখ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিছু অভিভাবক মনে করেন, তাদের সন্তানদের এখন কাজে যাওয়ার সময়, এই ষাঁড় নিয়ে মেতে থাকার বয়স তাদের নেই। একজন অভিভাবক বলেন, '*ফুয়া ডাগর অই গেসে। নিজ দোকান দিবো পরের বছর। ষাঁড় লই মাতি থাকে, অখন ছোড নি মাই?*' ইস্কাপন গ্রামে ষাঁড়-মালিক পরিবারগুলোর ষাঁড় ও পুরুষকে ঘিরে যে সামাজিক জ্ঞান উৎপাদিত হয়, তা গ্রামের বিভিন্ন পরিসরে ছড়িয়ে পরে, এবং যাদের লড়াইয়ের ষাঁড় নেই, তাঁরাও সেই জ্ঞানগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ধারণ ও চর্চা করে। একই সাথে ষাঁড়ের লড়াইয়ের জন্য ষাঁড় কেনা তথা সামাজিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সামাজিক চাপ অনুভবের প্রবণতাও দেখা যায় অনেক গ্রামবাসীদের মাঝে। আর এভাবেই লড়াইয়ের ষাঁড় শুধু বাজি ধরে লড়াই করে না, বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরে পুরুষত্বের প্রতীককে প্রতিষ্ঠিত করে এবং এই পুরুষত্বকে ধারণের নিরন্তর তাগিদ প্রদান করতে দেখা যায়।

৫. নারী, ষাঁড় ও লড়াই

ইস্কাপন গ্রামে ষাঁড়-লড়াইকে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংকৃতিক অনানুষ্ঠানিক চর্চায় নারীকে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় পাওয়া যায়। নারীর এই নিষ্ক্রিয়তা নারীর পূর্ণ ইচ্ছায় চর্চিত, এমনটা বলা যায় না। ইস্কাপন গ্রামে ষাঁড়-লড়াইয়ের বিভিন্ন স্তরে নারীর যে নিষ্ক্রিয়তা, বা জনপরিসরে লড়াইকে ঘিরে নারীর যে বাস্তবতা, তা নারীর জনপরিসরে অন্যান্য কর্মকাণ্ডকে ঠিক একইভাবে প্রভাবিত করে না। ষাঁড়-লড়াইয়েকে ঘিরে নারীর যে সাবজেক্টিভ ভূমিকা, তা সমাজে ডিসকোর্স আকারে প্রতিষ্ঠিত, এবং তা সমাজের বিভিন্ন স্তরের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চর্চিত হয়। অর্থাৎ, একজন নারী, যিনি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করেন, কিংবা অন্য একজন নারী যিনি, কোন একটি এনজিওর স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করেন, তাঁরা উভয়ই গ্রামের বিভিন্ন জনপরিসরে যাতায়াতের অধিকার রাখেন, এবং তাদের এই জনপরিসরের যাতায়াতকে গ্রামে 'খারাপ', 'শরমের' বা 'বাজে' কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। ইস্কাপন গ্রামে নারী জনপরিসরে সকল অর্থে নিষ্ক্রিয় না, কারণ এই গ্রামের নারীরা বাজারে যায়, নিকটবর্তী উপজেলা সদর কিংবা সিলেট শহরের বাজারেও তাদের যাতায়াত আছে। এই সকল জনপরিসরকে নারীর জন্য সমস্যাজনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়না, যেমনটা করা হয় তার ষাঁড়-লড়াইয়ের ময়দানে উপস্থিতিকে।

এই গবেষণার অন্যতম প্রধান নারী তথ্যদাতা, যিনি প্রায় বাইশ বছর ধরে এই গ্রামে বিবাহসূত্রে আছেন এবং বিয়ের পর থেকেই তার শ্বশুরবাড়িতে লড়াইয়ের ষাঁড় দেখে অভ্যস্ত। তিনি বিগত এই বছরগুলোতে অনেকগুলো ষাঁড়ের যত্ন নিয়েছেন খুব কাছ থেকে। তিনি এই ষাঁড়ের লড়াই কেন দেখতে যান নি, বা তার কি যেতে ইচ্ছা করেনি, এমন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '*ষাঁড় বড় করছি, ভূষি দিছি, মাইর দেখবার সাহস নাই। বিশ্বনাথ থানাত তোমার চাচার নাম আছে না নি? লোকে দেখলে কইবো শখ অইছে। অখন বাইর লাগাত অইতো, দেখতাম। দূরো গি লোকের কথা হুনতাম না।*' এই উদ্ধৃতি অনেকগুলো বিষয়কে স্পষ্ট করে, যেমন, অন্য অনেক স্থানের মতই এই সমাজে নারীর সামাজিক পরিচিতি তার স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত। অন্যদিকে 'ঘর' এবং 'দূর' এর মাঝে একটি সাংস্কৃতিক নির্মাণ আছে। লড়াইয়ের ময়দান, এই নারীর ঘর থেকে সর্বোচ্চ এক কিলোমিটার দূরে, কিন্তু নিকটবর্তী বাজার আরও দূরে। সেই বাজারে তিনি যদি অন্য নারী বা একাও যান, সেটা সামাজিকভাবে লজ্জাজনক হবেনা, যেটা কিনা, এই খেলার ময়দানে উপস্থিত থাকার মাধ্যমে হবে। অর্থাৎ, এই খেলার ময়দানকে আমরা একটি পরিসর হিসেবে দেখতে পাই যা একটি সামাজিক প্রথার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এবং এই পরিসরকে এই গ্রামের বাস্তবতায় নারীর জন্য একটি নিষিদ্ধ স্থান হিসেবে বিবেচিত। এখানে আরও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, নারীর এই সম্মানের ধারণা খুব নিবিড়ভাবে পুরুষের সম্মানের ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, এখানে নারী হিসেবে তার এজেন্সি পুরুষের এজেন্সির উপর নির্ভরশীল। গ্রামে এই নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা অন্য অনেক নারীর থেকে 'ভালো'। তিনি পরিবারের ভেতরে অনেক ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা রাখেন, যেমন ধান কোথায় বিক্রয় হবে, কিংবা সন্তান কোথায় পড়ালেখা করবে ইত্যাদি। তিনি তার পছন্দমত অর্থনৈতিক ব্যয়ের স্বাধীনতা রাখেন। সমাজে 'বঞ্চিত নারীর' যে ধারণা তা থেকে তিনি অনেক 'স্বাধীন' এবং 'মুক্ত'। তবে লড়াইয়ের ময়দানে শারীরিক উপস্থিতি কোনভাবেই সম্ভব নয় তার জন্য। একে তিনি নিষেধাজ্ঞা হিসেবে না দেখে একে সামাজিক 'নিয়ম' বা প্রথা হিসেবে দেখছেন। অর্থাৎ, ইস্কাপন গ্রামে নারীর গতিশীলতা শুধু ব্যক্তিগত ও জনপরিসরের নির্মিত ধারণার মধ্য দিয়ে বুঝলে চলবে না বরং এর ভেতর ব্যক্তিগত ও জনপরিসরগুলো সমাজের আরও অন্য অনেক উপাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এবং তাদের সাপেক্ষে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই জনপরিসর সম্পর্কে সমাজে কিছু ডিসকোর্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে পুরুষদের পুরুষত্ব চর্চার একটি জায়গা, সেখানে নারীর উপস্থিতি সমাজের পর্দা প্রথার ধারণার মধ্য দিয়ে নয়, বরং নারীর সাবজেক্টিভ ভূমিকার সীমানা দিয়ে অনুধাবন করতে হবে।

এই গ্রামে নারীর সাথে লড়াইয়ের ষাঁড়ের অনেক ক্ষেত্রেই অনেক নিবিড় সম্পর্ক দেখা যায়। ষাঁড় বাজার থেকে পছন্দ করে কিনে নিয়ে আসেন পুরুষেরা। কিছু কিছু পরিবারে ষাঁড় লালন-পালন করার জন্য আলাদা ব্যক্তি নিযুক্ত থাকেন, কিন্তু তার পরেও ঘরের ভেতরে ষাঁড়ের খাবার তৈরি করা থেকে তার থাকার ঘর পরিচ্ছন্ন করার কাজের বিভিন্ন স্তরে নারীর ভূমিকা থাকে। এ প্রসঙ্গে একজন নারী বলেন '*সকলে মিলিয়াই দেখাশোনা করে। আমার সকালো উঠায়াই ভাত রান্ধা লাগে। তখন মাড় রাখিয়া দেই। কামলা যেদিন আইয়ে না নি, বাড়িত ত সকালবেলা আমার ফুয়া ভূষি দিয়া যায়গি। পরে দুপুরে আমি গিয়া আবার গম আর মাড় দি আসি। সন্ধ্যা লাগাত কেউ না থাকলে হাত বুলাইয়া গিয়া দরজার তালা দি আসি।*' এভাবে বিভিন্ন বাড়িতে ষাঁড়ের যত্নের সাথে নারীর সম্পর্ক দেখা যায়। অনেকদিন ধরে ষাঁড় একটি পরিবারে থাকার কারণে তার সাথে একটি আন্তরিকতার সম্পর্ক তৈরি হয়। লড়াইয়ের দিন, পরিবারের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের দোয়া পড়ে ফুঁ দেন, শুধু জয়ের জন্য না, বরং, ষাঁড়টি যেন বেশি আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। এ প্রসঙ্গে আরেকজন নারী বলেন, '*মাইরো যাইবার লাগিয়া বাড়িতো আমরা মালা বানাইয়া গরুর গলাত ফড়াই। থাকতে থাকতে তো আমরারই মানুষ অইয়া যায়। মায়া লাগিয়া যায়। ইতার লাগিয়া মাইরো গেলে টেনশন লাগে। যদি বেশি মাইর লাগিয়া যায় এরপরে তো অসুস্থ হইয়া যাইবো।*' এভাবেই ষাঁড়ের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেন স্থানীয় একজন নারী। ষাঁড়কে পরিবারের একজন সদস্যের মত করেই দেখতে শুরু করেন, এবং ষাঁড়ের অসুস্থতা বা আহত হবার সম্ভাবনা তাদের মধ্যে চিন্তার উদ্রেক ঘটায়। এই ষাঁড় যখন বাড়ির সীমানার বাইরে যায়, তখন সে পরিচয় লাভ করে পুরুষ মালিকের নামের ষাঁড় হিসেবে, যেমন কয়েস বা লোদি চাচার ষাঁড় হিসেবে। বাড়ির বাইরে যাবার সাথে সাথেই ষাঁড়ের সাথে নারীর যে সম্পর্ক, তার সামাজিক স্বীকৃতি আর থাকেনা, একই সাথে, নারীর সেই ষাঁড়ের উপর 'অধিকার' বা 'দাবী' প্রতিষ্ঠা করার কোন সামাজিক ভিত্তি থাকেনা।

৬. উপসংহার

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের একটি গ্রামে নারীত্ব ও পুরুষত্বের নানান ধরন এবং সমাজের প্রথার সাথে পুরুষত্বের ধরণ কী তা উপস্থাপন করা হয়েছে। 'খেলা'কে অনেক ক্ষেত্রেই একটি অরাজনৈতিক প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করে থাকি, যা আসলে কোনভাবেই অরাজনৈতিক নয়, বরং, খেলার মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতার অনেক চর্চাগুলো খুব স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। নৃবিজ্ঞানে খেলাকে বর্তমান সময়ে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে অধ্যয়ন করে এবং এর মধ্য দিয়ে কীভাবে পরিচয়ের রাজনীতি কাজ করে তা উপস্থাপন করে। খেলা কীভাবে একটি প্রথাতে পরিণত হয় এবং তা কীভাবে সমাজের নারী-পুরুষের সাবজেক্টিভ ভূমিকাকে তুলে ধরে তার প্রতিটি চর্চার মাধ্যমে, তা এই লেখায় দেখানো হয়েছে। লড়াইয়ের ষাঁড় শুধু একটি ষাঁড় নয় বরং এর উপরে অধিকার অর্জিত হওয়ার মাধ্যমে একজন পুরুষের সমাজে নানা ধরনের সামাজিক সম্পর্কের ধরন পরিবর্তিত হয়, এবং তা সামাজিক ও প্রতীকী পুঁজি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পুরুষের এই প্রতীকী অবস্থানের বিপরীতে আবার নারীর অবস্থান নির্দেশিত হয় এবং নারীর পরিসর এই খেলাকে ঘিরে একভাবে নির্মিত হয়, যা আবার প্রচলিত পর্দা প্রথার সাথে সম্পর্কহীন। অন্যদিকে সমাজ যাদুবিদ্যার কারণে কিছু নারীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে, আবার সেই ষাঁড় লড়াইয়ের প্রয়োজনে তাদেরকে নারীর জন্য নিষিদ্ধ ময়দানের কাছে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। অর্থাৎ এই সমগ্র লেখায় নারীত্ব বা পুরুষত্বের একক কোন রূপ দেখা যায় না, বরং তা চর্চার ধরনের সাথে পরিবর্তনশীল কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই লিঙ্গীয় মতাদর্শের উপর নির্ভর করেই পুরুষত্ব নির্মিত হয়।

টীকা

[i] সিলেটের স্থানীয় ভাষায় মাইর বলতে সাধারণত মারামারি বা সংঘাতকে বুঝানো হয়। মাইর শব্দটি স্থান ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন অর্থ তৈরি করে যেখানে ষাঁড়ের লড়াইকেও মাইর বলে আখ্যায়িত করা হয়। সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার একটি গ্রাম ইস্কাপন (ছদ্মনাম), যেখানে প্রায় প্রতিবছর শীতকালে একটি নির্দিষ্ট মাঠে ষাঁড় লড়াইয়ের আয়োজন করা হয়। এই লড়াইয়ের মাঠে দর্শক এবং অংশগ্রহণকারী হিসেবে শুধুমাত্র পুরুষেরা উপস্থিত থাকে এবং নারীদের উপস্থিতি সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। নারীর অনুপস্থিতি এই গ্রামে একটি স্বাভাবিক বিষয় বরং এ নিয়ে প্রশ্ন করাটাই অস্বাভাবিক বলে মনে করেন অধিকাংশ উত্তরদাতা। এই প্রবন্ধে ইস্কাপন গ্রামে ষাঁড় লড়াইকে ঘিরে নারী-পুরুষের লিঙ্গীয় সম্পর্ককে উপস্থাপন করা হয়েছে। সমগ্র লেখায় ষাঁড় লড়াইকে স্থানীয় ভাষার মাইর হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে উল্লেখিত তথ্যদাতাদের ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

[ii] আনুষ্ঠানিক ষাঁড় লড়াইয়ে বাজি (bet) ধরা হয় প্রতিটি লড়াইয়ের। বাজি ধরা নিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা থাকলেও, ইস্কাপন গ্রাামে বড় ময়দানে বাজি ছাড়া ষাঁড় লড়াই হয় না।

তথ্যসূত্র

গুহঠাকুরতা, মেঘনা (২০০২) *নারী ও রাষ্ট্র, বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

মীর, আজমাইন মুনতাসীর (২০১৪) আকাঙ্খার স্বরূপ, আকাঙ্খার নির্মাণের প্রক্রিয়া এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী ও পুরুষের সক্রিয়তা, *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা*, সংখ্যাঃ ১৯, পৃঃ ১১০-১১১, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা।

নাহার, আইনুন (১৯৯৩) মুসলিম আইনের দৃষ্টিতে নারীঃ প্রেক্ষীত বাংলাদেশের পরিবার পরিসর, *সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র*, সংখ্যাঃ ৪৭, ঢাকা।

হারুন, অবন্তী (১৯৯৯) বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারীঃ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে। *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা*, সংখ্যাঃ ০৪, পৃঃ ১১০-১২৪, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা।

হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ (২০০২) *বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

হোসাইন, নাসিম আখতার (২০০২) *জেন্ডার মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ডিসকোর্সঃ নারীবাদী চিন্তার আলোকে একটি বিশ্লেষণ, বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ,* ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

Almeida, Miguel Vale De (1997) Gender, masculinity and power in southern Portugal. *Social Anthropology*, Vol. 5 No. 2. Pp 141-158.

Appadurai, Arjun (1995) Playing with Modernity: The Decolonization of Indian Cricket, *Consuming Modernity: Public Culture in a South Asian World*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Appadurai, Arjun (1996) *Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization.* University of Minnesota Press.

Balkmar, Dag (2012) On Men and Cars: An Ethnographic Study of Gendered, Risky and Dangerous Relations, *Linkoping Studies in Arts and Science,* No: 558,Linkoping: Linkoping University.

Beiras, A., Cantera, L. & de Alencar-Rodrígues, R. (2015) *I Am a Bull! The Construction of Masculinity in a Group of Men Perpetrators of Violence against Women in Spain*, Spain: Bloomsbury publishers.

Berger, Maurice; Brian Wallis; Simon Watson; Carrie Mae Weems (1995) *Constructing Masculinity*. Routledge, New York

Besnier, Niko, Susan Brownell, and Thomas F. Carter (2018) *the Anthropology of Sport: Bodies, Borders, Biopolitics.* University of California Press.

Bourdieu, P. (1972) *Outline of a theory of practice*, Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, P. (1986) The forms of capital, in Richardson, J eds. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education,* p. 241-258, New York: Greenwood.

Brandes, Stanley (2009). Torophies and Torphobes: The Politics of Bulls and Bullfights in Contemporary Spain. *Anthropological Quarterly.* Vol. 82. No. 3. Pp. 207-216.

Britto, Francis (1986) Personal Names in Tamil Society, *Anthropological Linguistics*, Vol. 28, No. 3 (Fall), pp. 349-365, Indiana: Indiana University.

Brown, Brene (2013) *Shame v. Guilt*.

Available from: https://brenebrown.com/blog/2013/01/14/shame-v-guilt/ [Retrieved on 5 February 2020].

Bruck, Gabriele and Bodehhorn, Barbara (eds) (2006) *The Anthropology of Names and Naming*, Cambridge: Cambridge University Press.

Connell, R. W. (1995) *Masculinities*, Berkeley: University of California Press.

Douglass,Carrie B. (1997). *Bulls, Bullfighting, and Spanish Identities.* University of Arizona Press.

Gannon, M. & Pillai, R. (2010). The Spanish Bullfight. In *Understanding global cultures: Metaphorical journeys through 29 nations, clusters of nations, continents, and diversity* (pp. 511-528). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Geertz, Clifford (1973) *The Interpretation of Cultures*, New York:Basic book ink.

Kabaji, Egara (2008) Masculinity and Ritual Violence: A study of Bullfighting among the Lahiya of Western Kenya, in *Egodi Uchendueds*. *Masculinity in Contemporary Africa*, Senegal: Council for The Development of Social Science Research.

Pascoe and Bridge (2016) *Exploring Masculinit*y, New York: Oxford university press.

Pink, Sarah (1997) *Women and Bullfighting: Gender, Sex and the Consumption of Tradition*, London:

Saimima, Leendert Farrell & Mulyani, Sri (2018) Bullfighting and Masculinity in Jorge Gutierrez's The Book of Life. *Journal of Language and Literature* Vol. 18 No. 1. Pp 82-97.

Thompson, Kirrilly Rebecca (2010) Binaries, Boundaries and Bullfighting: Multiple and Alternative Human-Animal Relations in the Spanish Mounted Bullfight in *Anthrozoos A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals.* Volume 23, Issue 4. Pp. 317–336

Turner, Victor (1973) Symbols in African Ritual, *Science*, vol. 179, 1100-05.

Turner, John and Penny Oaks (1986) The Significance of The Social Identity Concept for Social Psychology with Reference To Individualism: Interaction And Social Influence, *British Journal of Social Psychology*, Vol. 25, Pp. 237–252, Blackwell, United Kingdom.

Uchendu, Egodi (2008) *Masculinity in Contemporary Africa*, Senegal: Council for the Development of Social Research.

Urla, Jacqueline (1999) A Review on Women and Bullfighting: Gender, Sex and the Consumption Tradition, *American Anthropologist*, Vol:101, No. 2, Pp. 459-460, USA: American Anthropological Association.

Wellard, Ian. (2009) *Sport, Masculinities and the Body.* Taylor & Francis

White, Sarah C. (1992) *Arguing with the Crocodile: Gender and Class in Bangladesh*, London: Zed Books Ltd.